ভূমিকা

মানব সভ্যতার শ্রেষ্ঠ আবিষ্কার ভাষা। মানুষের সঙ্গে মানুষের ভাবের বিনিময়, হৃদয়ের আদান-প্রদান ও আন্তরিক মিলন সম্ভব করে তুলেছে এই ভাষা। সে হয়ে উঠেছে যুগ যুগান্তরব্যাপী প্রসারিত এক সেতুবন্ধ। ভাষা বয়ে চলা নদীর মতো। তার অনেক সারল্য, অনেক বাঁক, অনেক উত্থান-পতন। ভাষার নদীটি প্রবাহিত হয়ে এসেছে প্রধানত দুটো ধারায়— ১. লেখ্যভাষা, ২. কথ্যভাষা। একটি গ্রহণযোগ্য মানদণ্ডে লেখ্যভাষাটিকে চয়ন করে রাখা হয়েছে। লেখ্যভাষা বা লেখার ভাষার একটি সর্বজনীন রূপ আছে। কথ্যভাষা বা মুখের ভাষার তেমন কোন সর্বজনীন রূপ নেই। তাই বাঁকে বাঁকে বদলে যেতে থাকে তার রূপ, রঙ, রস। প্রাচীনকাল থেকেই মানুষ দলে দলে ভাগ হয়েছে, বিশেষ অঞ্চলে দলবদ্ধভাবে থেকেছে। আবার মানুষ বিভক্ত হয়ে গেছে জাতিতে, গোষ্ঠীতে, সম্প্রদায়ে ও শ্রেণিতে। মানুষ যেমন বিভক্ত হয়ে গেছে তেমনি বিভক্ত হয়ে গেছে মানুষের ভাষাও। ভাষা হয়ে দাঁড়িয়েছে নির্দিষ্ট দেশের ভাষা, প্রদেশের ভাষা, অঞ্চলের ভাষা, জাতির ভাষা, গোষ্ঠীর ভাষা, সম্প্রদায়ের ভাষা ও শ্রেণির ভাষা। অধিকাংশ মানুষ বসবাস করে গ্রামে। অধিক সংখ্যক লোকের ভাষা কথ্যভাষা, আঞ্চলিক ভাষা ও লোকভাষা। এই সব মানুষের কথনরীতি, উচ্চারণ বৈশিষ্ট্য, শব্দ প্রয়োগ ভাষাকে এক আলাদা মাত্রা দান করেছে। প্রত্যেক জেলার ভাষাতেও এমন কথনরীতির পার্থক্য লক্ষ করা যায়। বিহার সংলগ্ন উত্তর দিনাজপুর জেলার কথ্যভাষাও তেমনি আপন বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল।

বাল্যকাল থেকেই উত্তর দিনাজপুর জেলার অধিবাসী হওয়ার সুবাদে এই জেলার বাংলা কথ্যভাষার একটি স্বতন্ত্র রূপ আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। ভৌগোলিক দিকে থেকে উত্তরে দার্জিলিং জেলা, দক্ষিণে মালদা জেলা, পূর্বে দক্ষিণ দিনাজপুর ও পশ্চিমে বিহার রাজ্যের উপস্থিতি। ভারতবর্ষ স্বাধীন হবার পর ইসলামপুর মহকুমাটি বিহার রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৯৫৯ সালে বিহার রাজ্য থেকে পৃথক করে ইসলামপুর মহকুমাটিকে পশ্চিম দিনাজপুরের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ১৯৫৯ সালের আগে ইসলামপুর মহকুমার মাতৃভাষা ছিল উর্দু। পরবর্তীকালে বাংলা, উর্দু ও হিন্দি ভাষা পাশাপাশি চলতে থাকে। পাশ্ববর্তী বিহার

রাজ্যের অতি নৈকট্যের ফলে হিন্দি, বিহারী, ভোজপুরি ইত্যাদি ভাষাগুলির সঙ্গে উত্তর দিনাজপুরের প্রচলিত বাংলা মান্যচলিত, রাজবংশী, শেরশাবাদিয়া, বঙ্গালী, সূর্যাপুরি ও মাড়োয়ারীদের ভাষার সংমিশ্রণের ফলে সৃষ্টি করেছে এক অদ্ভুত ভাষা পরিবেশ—যা অত্যন্ত আকর্ষণীয় ও কৌতূহলোদ্দীপক। এর পাশাপাশি ইংরেজি ভাষার প্রবল প্রভাব আঞ্চলিক ভাষার রূপান্তরে বড় ভূমিকা পালন করেছে। তাই সৃষ্টি হচ্ছে অদ্ভুত শব্দ ও নতুন ভাষার। পশ্চিম বাংলার উত্তর দিনাজপুর ও বিহার রাজ্যের সীমান্তবর্তী এলাকা যেমন ইসলামপুর, কিষাণগঞ্জ, পূর্ণিয়ামোড়, ডালখোলা ও বারসই ইত্যাদি অঞ্চলগুলিতে সৃষ্টি হয়েছে এক অদ্ভুত মিশ্রভাষা। এই মিশ্রভাষা আমাদের সঞ্চার করেছে আকর্ষণ, বৃদ্ধি করেছে আগ্রহ ও জাগিয়েছে কৌতূহল, তাই আমরা গবেষণা করার তাগিদ অনুভব করেছি।

অবিভক্ত পশ্চিম দিনাজপুর জেলা নিয়ে গবেষণা করেছেন সুভাষচন্দ্র রায়চৌধুরী ‘পশ্চিম দিনাজপুর জেলার উপভাষা’ শিরোনামে। ‘উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুরের অভিবাসিত চলন বিল অঞ্চলের কথ্যভাষা’ নিয়ে গবেষণা করেছেন জীবন কুমার ঘোষ। এছাড়া দু-একটি প্রবন্ধে উত্তর দিনাজপুরের কথ্যভাষা নিয়ে আলোচনা হয়েছে। কিন্তু বিহার সংলগ্ন উত্তর দিনাজপুর জেলার কথ্যভাষা নিয়ে এ যাবৎ কোনো গবেষণা কাজ হয়নি। আমাদের গবেষণা সেই শূন্যতা পূরণ করবে বলে আশা রাখছি।

ক্ষেত্র সমীক্ষায় ভাষা সংগ্রহের প্রয়োজনে সর্ব প্রথম উত্তর দিনাজপুর জেলার ভৌগোলিক, ঐতিহাসিক, আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বিষয়ে জানার ও বোঝার চেষ্টা করি। কয়েক বৎসর ধরে সমগ্র জেলার বিভিন্ন গ্রামে ঘুরে ঘুরে নানা ধরণের তথ্য সংগ্রহে ব্যাপৃত হই। বিহার সংলগ্ন উত্তর দিনাজপুর জেলার দক্ষিণ থেকে ক্রমশ উত্তর দিকে বারসই, ডালখোলা, পূর্ণিয়ামোড়, কিষাণগঞ্জ ও ইসলামপুর অঞ্চলগুলিতে বিশেষভাবে ক্ষেত্রসমীক্ষায় আত্মনিয়োগ করি। ক্ষেত্রসমীক্ষায় গ্রামাঞ্চলের বেশিরভাগ বয়স্ক নিরক্ষর ব্যক্তিবর্গের সাহায্য নিই। আবার সমাজভাষাবিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গিতে বিভিন্ন সামাজিক মাত্রাভেদেও ভাষিক উপাদান সংগ্রহ করেছি।

ক্ষেত্রসমীক্ষায় ভাষা সংগ্রহের প্রয়োজনে যে পদ্ধতিগুলি অবলম্বন করেছি তা হলো—

১. সকাল-বিকাল ও সন্ধ্যা বিভিন্ন গ্রামের চায়ের দোকানে বসে বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের আড্ডার কথোপকথন শুনেছি ও ভয়েস রেকর্ডারে রেকর্ড করি।

২. স্থানীয় বেশ-ভূষা পরিধান করে বিভিন্ন গ্রামে গ্রামে ঘুরে ঘুরে ভাষিক উপাদান সংগ্রহ করেছি।

৩. গ্রাম্য ধর্মীয় অনুষ্ঠান, সামাজিক অনুষ্ঠান, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও ঝগড়া বিবাদের মধ্যে উপস্থিত থেকে লুকিয়ে লুকিয়ে সবার অলক্ষ্যে একের সঙ্গে অন্যের কথোপকথন, গান, ছড়া, ধাঁধা, প্রবাদ, কলহ প্রভৃতি তথ্য-উপাদান রেকর্ড করে রাখি।

৪. ধ্বনির উচ্চারণের বিভিন্নতা পরীক্ষা করার জন্য নানাপ্রকার জিনিসের ছবি দেখিয়ে সেগুলির আঞ্চলিক নাম ও উচ্চারণ কীরূপ তা জেনে নিই।

৫. 'ঠকবাজ গাধা' লোককথাটিকে মডেল ধরে জেলার দক্ষিণ প্রান্ত থেকে শুরু করে উত্তর প্রান্ত পর্যন্ত সীমান্তবর্তী এলাকায় প্রায় পঁয়ত্রিশটি গ্রামের ভাষা সংগ্রহ মাধ্যমে রূপান্তর/অনুবাদ করি।

৬. ক্ষেত্রসমীক্ষায় সামাজিক অবস্থান, জাতি, লিঙ্গ, বয়স, ধর্ম, পেশা, শিক্ষা, ট্যাবু, সংস্কার, বিশ্বাস, সামাজিক অনুশাসন, সংস্কৃতি, পরিবেশ-পরিস্থিতি প্রভৃতি মাত্রা ভেদে সূক্ষ্ম ও পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাষিক উপাত্ত সংগ্রহ করি।

আমরা গবেষণা অভিসন্দর্ভটিকে মোট ৭টি অধ্যায়ে বিন্যস্ত করেছি। প্রথম অধ্যায় : উত্তর দিনাজপুর জেলার সাধারণ পরিচয়, দ্বিতীয় অধ্যায় : ধ্বনিতত্ত্ব, তৃতীয় অধ্যায় : রূপতত্ত্ব, চতুর্থ অধ্যায় : বাক্যরীতি, পঞ্চম অধ্যায় : শব্দভাণ্ডার, ষষ্ঠ অধ্যায় : শব্দার্থতত্ত্ব ও সপ্তম অধ্যায় : সমাজভাষাবিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গিতে বিশ্লেষণ।

প্রথম অধ্যায়ে উত্তর দিনাজপুর জেলার ভৌগোলিক, ঐতিহাসিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, প্রশাসনিক, সাংস্কৃতিক ও জনতাত্ত্বিক রূপরেখা তুলে ধরা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে ধ্বনিতাত্ত্বিক (phonology) আলোচনা করা হয়েছে। এই অধ্যায়ে কথ্যভাষায় ব্যবহৃত মৌলিক স্বরধ্বনি তালিকা, স্বরধ্বনির অবস্থান, উচ্চারণ অনুযায়ী স্বরধ্বনির প্রকৃতি ও পরিবর্তন, দ্বি-স্বরধ্বনি, ধ্বনি পরিবর্তন-ধ্বনির আগম, ধ্বনিলোপ, ধ্বনির রূপান্তর, ধ্বনির স্থানান্তর দেখানো হয়েছে।

আদ্য 'অ' ধ্বনির পরে 'ই', 'উ' ধ্বনি থাকলে আদ্য 'অ' 'ও' রূপে উচ্চারিত হয়। যেমন— হইবে > হোবে, খই > খোই। শব্দে দ্বিতীয় ব্যঞ্জনে 'আ' ধ্বনি থাকলে আদ্য 'অ'

সর্বদাই 'আ' রূপে উচ্চারিত হয়। যেমন—কাফন > কাফুন, সালন > শালুন। আদ্য 'অ' 'অ্যা' রূপে উচ্চারিত হবার প্রবণতা বেশি। যেমন—কত > ক্যাত্‌লা, কখন > ক্যাখুন। 'আ' স্বরবর্ণটি দীর্ঘ হলেও কথ্যভাষায় প্রায় সর্বত্রই হ্রস্বস্বর রূপে উচ্চারিত হয়। আদ্য 'উ' পরবর্তী 'আ' ধ্বনির প্রভাবে 'ও' রূপে উচ্চারিত হয়। যেমন—সুতা > সোতা, মুঠা > মোটা, অ, আ, ই, এ, উ, ও প্রতিটি স্বরধ্বনিই 'অ্যা' ধ্বনিতে রূপান্তরিত হয়। মধ্যপদস্থিত 'ক' ঘোষীভবনের ফলে কখনো 'গ' হয়েছে। যেমন—শাক > শাগ্, সকল > সগল। মধ্যপদস্থিত মহা প্রাণিত 'ক', 'খ' হয়েছে। যেমন—পুকুর > পৈখোর, দোজক > দুজখ। পদমধ্যে ও পদান্তে 'চ' মৃদু 'স' রূপে উচ্চারিত হয়। 'চ' এর উচ্চারণ ইংরেজী ch বা tch এর মতো না হয়ে অনেকটা ts এর মতো হয়। যেমন— কোরিচে > কোইসে, করিচু > কইসু। আদ্য 'র' অনেক ক্ষেত্রেই 'অ' রূপে উচ্চারিত হয়। যেমন—রং > অং, রোসুন > অসুন। আবার পদের আদিতে 'র' লুপ্ত হতে পারে। যেমন—রূপা > উপা, রাক্ষস > অ্যাইখ্‌খস। দ্বিমাত্রিকতা লক্ষ্য করা যায়। যেমন—চিরুণি > চির্‌ণি, বামুনি > বাম্‌নী। সকারীভবন ও ল-কারীভবন এই কথ্যভাষার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। চ, ছ, জ, ঝ ইত্যাদি উষ্মধ্বনিগুলি 'স' ও 'শ' -এর মতো উচ্চারিত হয়। যেমন—গাছ > গাস, করিচু > কোরিসু। 'ন' ও 'র' ধ্বনি 'ল' ধ্বনিতে রূপান্তরিত হয়। যেমন—নসিব > লশিব, করলা > কৈল্‌ল্যা।

তৃতীয় অধ্যায়ে রূপতত্ত্ব (Morphology) বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। এই অধ্যায়ে রূপিমের সাহায্যে শব্দগঠন প্রক্রিয়া, ক্রিয়ারকাল, অসমাপিকা ক্রিয়া, যৌগিক ক্রিয়া, সংযোগমূলক ক্রিয়া, অস্ত্যর্থক ক্রিয়া, নঞর্থক ক্রিয়া, প্রযোজক ক্রিয়া, নামধাতু, শ্রেণি বিভাগ সহ বিভিন্ন কারক ও কারক বিভক্তি, উপসর্গ, অনুসর্গ, সর্বনাম প্রভৃতির রূপতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা তুলে ধরা হয়েছে। এছাড়াও লিঙ্গ, বচন, বিশেষ্যমূলক রূপিম, বিশেষ্যমূলক পদগঠন, বিশেষণমূলক পদ গঠন, পদাশ্রিত নির্দেশক, যৌগিক পদ, সমাসবদ্ধ শব্দ, শব্দদ্বৈত, ধ্বন্যাত্মক শব্দ ইত্যাদির বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা করা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয় বাক্যরীতি বা বাক্যতত্ত্ব (Syntax)। এই অধ্যায়ে বাক্যের পদ সংস্থান, সর্বনাম পদের ব্যবহার রীতি, বিশেষণ পদের ব্যবহার রীতি, অব্যয় পদের ব্যবহার রীতি, গঠনগত দিক থেকে বাক্যের শ্রেণিবিভাগ, ভাবগত দিক থেকে বাক্যের শ্রেণিবিভাগ, বাচ্য ইত্যাদি বিষয়গুলিকে ঐতিহ্যগত ব্যাকরণ (Traditional Grammer)

-এর সূত্র মেনে আলোচনা করা হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায় শব্দভাণ্ডার (Vocabulary)। এই অধ্যায়ে সংস্কৃতমূল শব্দ, দেশি শব্দ, আগন্তুক শব্দ ও মিশ্র শব্দের উপবিভাগের তালিকা এবং কথ্যভাষায় ব্যবহৃত শব্দগুলির পরিচয় প্রদান করা হয়েছে। আলোচ্য কথ্যভাষার শব্দভাণ্ডারে বিদেশি মূল শব্দের মধ্যে আরবি, ফারসি ও তুর্কি শব্দের প্রাচুর্য লক্ষ্য করা যায়।

ষষ্ঠ অধ্যায়ে শব্দার্থতত্ত্ব (Semantic) নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এই অধ্যায়ে শব্দার্থ পরিবর্তনের কারণ-আলংকারিক প্রয়োগ, সৌজন্য ও সুভাষণ রীতি, সংস্কারজাত বাচনিক নিষিদ্ধতা, পরিবেশ ও সমাজগত পরিবর্তন, সমোচ্চারিত শব্দের অর্থ পার্থক্য, বিশিষ্টার্থক শব্দের অর্থ পার্থক্য দেখানো হয়েছে। পাশাপাশি শব্দার্থ পরিবর্তনের ধারা-অর্থের বিস্তার, অর্থের সংকোচ ও অর্থের সংশ্লেষ কথ্যভাষার নিরিখে সূত্রাকারে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

সপ্তম অধ্যায় সমাজভাষাবিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গিতে বিশ্লেষণ (A Sociolinguistic Analysis)। এই অধ্যায়ে সমাজভাষাবিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গিতে আলোচ্য কথ্যভাষার জাতিভেদে ভাষা পরিবর্তন-দেশীয়, পলিয়া, কাপালি, নমঃশূদ্র, বাদিয়া, বাঙ্গাল; বয়সভেদে ভাষা পরিবর্তন-নবীন, মধ্যবয়স্ক, প্রবীণ; সামাজিক শ্রেণিভেদে ভাষা পরিবর্তন-কর্মভেদে বা পেশাভেদে ভাষা পরিবর্তন; অর্থনৈতিক অবস্থাভেদে ভাষা পরিবর্তন-উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত; শিক্ষা ভেদে ভাষা পরিবর্তন-নিরক্ষর, স্বল্প-শিক্ষিত, শিক্ষিত, উচ্চ-শিক্ষিত; লিঙ্গভেদে ভাষা পরিবর্তন-নারীর ভাষা, পুরুষের ভাষা; ধর্মভেদে ভাষা পরিবর্তন : পরিবেশ-পরিস্থিতি ভেদে ভাষা পরিবর্তন; অন্যান্য সূত্রে ভাষা পরিবর্তন- শ্রোতাভেদে ভাষা পরিবর্তন, উপলক্ষ্য ভেদে ভাষা পরিবর্তন, কৃত্রিমভাষা ভেদে ভাষা পরিবর্তন প্রভৃতি সামাজিক মাত্রাভেদে ভাষা পরিবর্তন বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টিভঙ্গিতে তুলে ধরা হয়েছে।